জাপানের প্রখ্যাত সাংবাদিক নাওয়াকি উসুই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খবর সংগ্রহের জন্যে এসেছিলেন রণাঙ্গনে। তুলেছিলেন অসংখ্য ছবি। আগামী ১২ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আমন্ত্রণে তিনি আসছেন বাংলাদেশে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে দান করেছেন একশ'টি ছবি। তাঁর তোলা মুক্তিযুদ্ধের কিছু ছবি তিনি ছাপতে দিয়েছেন সাপ্তাহিক ২০০০-এ। জাপান থেকে রিপোর্ট করেছেন **কাজী ইনসান**

জাপানি সাংবাদিক নাওয়াকি উসুই'র দেখা '৭১

'তিন দশকের বেশি সময় ধরে বিস্তৃত সাংবাদিকতা পেশার দিকে পেছন ফিরে তাকালে মধুর যে ধ্বনি আমার কানে বেজে ওঠে একটা দেশের নাম- বাংলাদেশ। আমার সাংবাদিকতা জীবনে প্রথমবারের মতো সত্যিকার অর্থে গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত দায়িত্ব পালনের দেশ, শুধু মৃত্যুকেই যেখানে আমি কাছে থেকে দেখিনি, একই সঙ্গে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ, স্বাধীনতা-পাগল আর সত্যিকার অর্থে সুখী মানুষের দেখাও সেখানেই আমি পাই। প্রথাগত ধর্মবিশ্বাসে আমার আস্থা নেই। তবে তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে প্রার্থনা আমি করি। আর আমার মনের একান্ত সেই প্রার্থনা হচ্ছে ওই

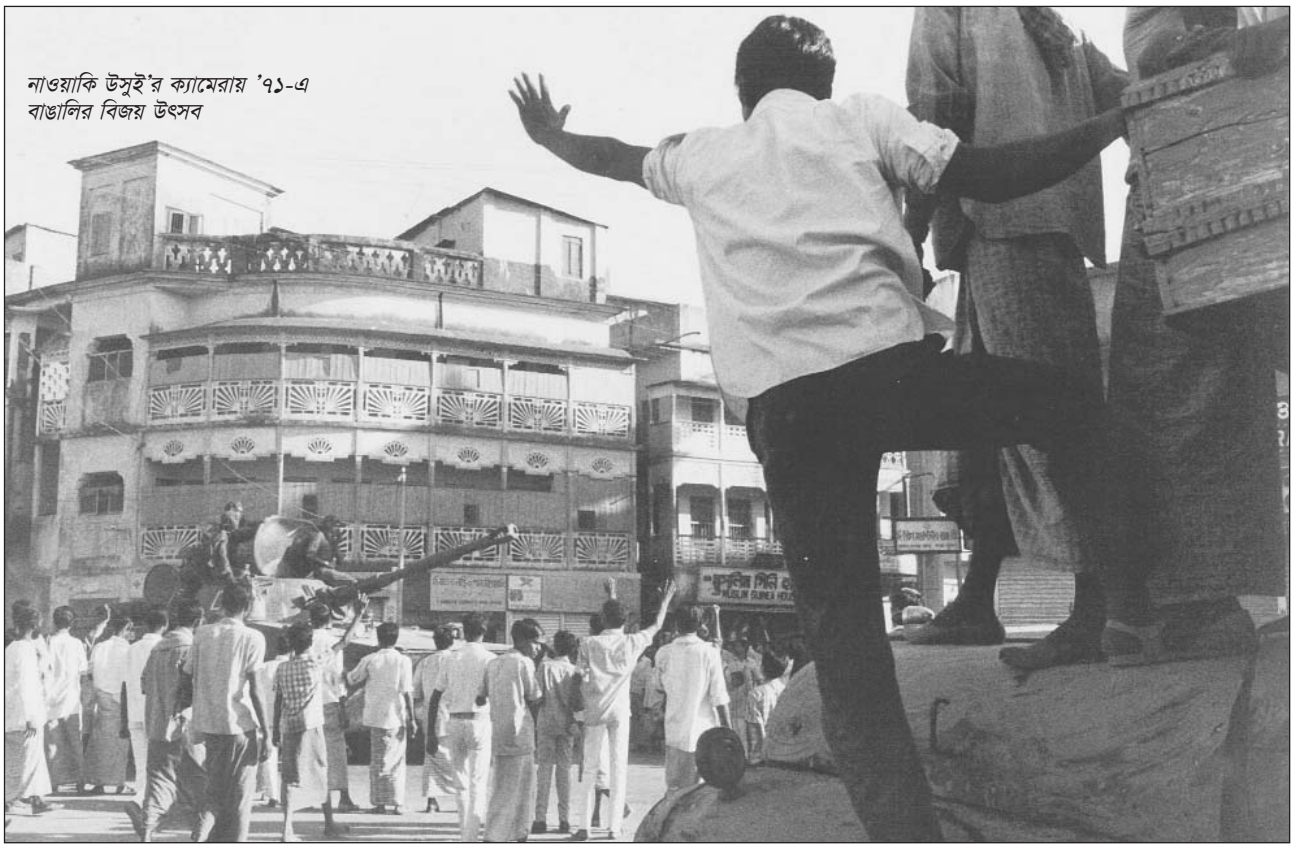

নাওয়াকি উসুই'র ক্যামেরায় '৭১-এ বাঙালির বিজয় উৎসব

ক্ষত বিক্ষত লাশ

দেশটির ক্রমাগত অগ্রযাত্রা আর সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা, যে দেশের জন্মের আমি একজন প্রত্যক্ষদর্শী।'

ওপরের কথাগুলো জাপানের সাংবাদিক নাওয়াকি উসুই'র স্বকণ্ঠ উচ্চারণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে, শরণার্থী শিবিরে, বিজয় মিছিলে। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করা একমাত্র জাপানি সাংবাদিক। জাপানি সাংবাদিক নাওয়াকি উসুই ১৯৭১ সালের নবেম্বরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহের জন্য ভারতের উদ্দেশে জাপান ত্যাগ করেন। দিল্লি ব্যুরো প্রধান হিসেবে তার প্রধান দায়িত্ব ছিল পুরো সময়জুড়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের খবরাখবর সংগ্রহ করে জাপানের বিভিন্ন সংবাদ সাময়িকীতে পাঠানো। কোলকাতা পৌঁছেই প্রথম তিনি শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করেন এবং অনেক বাধা অতিক্রম করে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পগুলোতে আসেন।

> শোনা যায় যে, বিশিষ্ট ফরাসি চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক আন্দ্রে মারলো বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে ট্যাঙ্কবহর নিয়ে খুব শীঘ্রই কোলকাতা যাচ্ছেন। আন্দ্রে মারলো তখন বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিরোধী ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই তিনি যশোর হয়ে বাংলাদেশের সদ্য হানাদারমুক্ত খুলনা অঞ্চলে প্রবেশ করেন। সংবাদ সংগ্রহে মি. উসুই ছিলেন একমাত্র জাপানি সাংবাদিক। পরে তিনি যৌথ বাহিনীর কাছে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের সাক্ষী হিসেবেও উপস্থিত ছিলেন। জেলা হিসেবে যশোরই ছিল প্রথম মুক্ত শহর। এতদিন পরে মি. উসুই ওই তারিখটাকে ৬ কিংবা ৭ ডিসেম্বর বলে অনুমান করছেন, খুলনা শহরে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের দিন তিনি ১৭ ডিসেম্বর বলে স্মরণ করছেন।

গত বিজয় দিবসে বাংলাদেশ সাংবাদিক-লেখক ফোরাম, জাপান একটি অনুষ্ঠানে সাংবাদিক নাওয়াকি উসুইকে প্রবাসীদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেন এবং সংবর্ধনা স্মারক উপহার দেন। সাংবাদিক উসুই'র ওপর বেশকিছু লেখা প্রথম আলো, ডেইলি স্টার ও ঢাকা কুরিয়ারে প্রকাশিত হলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এ বছরের বিজয় দিবসে মি. উসুইকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানায়। বাংলাদেশ সাংবাদিক লেখক ফোরাম জাপান ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যৌথভাবে তার এই সফরের আয়োজন করে এবং ব্যয়ভার বহন করে। গত আগস্ট মাসে আমি এই সফরের প্রাথমিক আয়োজনের জন্য ঢাকা আসি এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে সফরের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সে সময় সাপ্তাহিক ২০০০-এ সাংবাদিক উসুই'র ঢাকা সফরের আগেই এই সফর ও তার ওপর একটি লেখা বিজয় দিবস সংখ্যায় প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। সেই প্রেক্ষিতেই গত ৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় টোকিওর ফরেন প্রেসক্লাবে প্রায় দু' ঘন্টা ধরে সাংবাদিক উসুই'র সঙ্গে কথা বলি। নির্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট আগেই মি. উসুই আমাকে মোবাইলে ফোন করে জানান তিনি এখন টোকিও স্টেশনে। সুতরাং আর দশ মিনিটের মধ্যেই তিনি প্রেসক্লাবে পৌঁছবেন। পূর্বনির্ধারিত সময় অর্থাৎ সন্ধ্যা ৭টায় তিনি ঘর্মাক্ত ও ক্লান্ত হয়ে লবিতে এসে পৌঁছান- দু'হাতে অনেকগুলো প্যাকেট। বুঝলাম ঢাকা সফরের আয়োজন কাপড়-চোপড় কেনাকাটা। ভুল ভাঙলো যখন আমরা অফিসিয়ালি তার সাক্ষাৎকার শুরু করলাম। বড় বড় প্যাকেট থেকে তিনি বের করলেন '৭১ সালে তোলা তার শত শত ছবির কপি- বড় বড় করে A-3 Size করা শত শত ছবি, যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি,

মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি, শরণার্থী শিবিরের ছবি, বিজয় মিছিলের ছবি, গণপিটুনিতে মৃত রাজাকারের ছবি, সব আলাদা আলাদা করে সাজানো। প্রতিটি ছবির তিনি বর্ণনা দিতে লাগলেন। প্রায় ৩২ বছর পর তিনি ছবির বর্ণনা দিতে দিতে উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন। কিছু কিছু ছবি দেখে তিনি নামও বললেন। আমি যখন Freedom Fighter বলছিলাম- তিনি কিন্তু তাদের 'মুক্তিযোদ্ধা' বলেই সম্বোধন করছিলেন। স্পষ্ট বাংলা উচ্চারণে তিনি বলছিলেন 'জয় বাংলা', 'আমার নেতা তোমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব' স্লোগানের কথা। কথার মাঝে গুনগুনিয়ে উঠছিলেন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'।

সেই সব দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বারবার বলছিলেন একজন সাংবাদিকের সারা জীবনের সঞ্চয় হাতে গোনা দু'একটি ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করা। আমার সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় একটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা। তার সে সময়ের প্রায় সবগুলো রিপোর্টিংয়ের শিরোনাম ছিল 'কোনো মে দে মিতা বাংলাদেশ' Kono Me De Mita Bangladesh অর্থাৎ আমার এই চোখ দিয়ে দেখা বাংলাদেশ।

সাংবাদিক উসুই'র সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমরা ফিরে গেলাম '৭১-এ।

সাপ্তাহিক ২০০০ : নবেম্বরের শুরু থেকে মুক্তিবাহিনী ও পরে ভারতীয় বাহিনীর যৌথ আক্রমণের সময় থেকে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন পর্যন্ত সময়ে জাপানি সাংবাদিক হিসেবে একমাত্র আপনিই তো সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন। সে সময় দিল্লি ব্যুরোতে বেশ ক'টি জাপানি সংবাদপত্রের প্রতিনিধি থাকার কথা ছিল...

নাওয়াকি উসুই : হ্যাঁ, জাপানি সাংবাদিক হিসেবে সে সময় আমি একাই উপস্থিত ছিলাম, তাই আমার পত্রিকা ছাড়াও জাপানের অসংখ্য পত্রপত্রিকা, সাময়িকীতে আমাকে বাংলাদেশের দুর্দশার কথা লিখতে হয়েছিল। মাইনিচি শিম্বুনের প্রতিনিধি সে সময় বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে অন্য দেশে ছিলেন। আশাহি শিম্বুনের সাংবাদিক মধ্য জুন থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের খবর নিয়মিত পাঠাতেন। অক্টোবরের শেষ দিকে তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে বাধ্য হয়ে জাপানে ফিরে যান।

২০০০ : বাংলাদেশের যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহের অ্যাসাইনমেন্ট কিভাবে পেলেন?

নাওয়াকি উসুই : ব্যাপারটা বেশ মজার। সে সময় একটা গুজব শোনা যায় যে, বিশিষ্ট ফরাসি চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক আন্দ্রে মারলো বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে ট্যাক্সবহর নিয়ে খুব শীঘ্রই কোলকাতা যাচ্ছেন। আন্দ্রে মারলো তখন বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিরোধী ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত। স্বাধীনতা আন্দোলনরত জনগণের পক্ষে তিনি যে কোনো তৎপরতায় সাহায্যে প্রস্তুত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের জার্মানির দখলাধীন স্বদেশে মারলো নিজেও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাছাড়া স্পেনের গৃহযুদ্ধে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে মারলোর সমর্থন তখন বিশ্বব্যাপী আলোচিত তার উপন্যাস 'ডেইস অব হোপ'-এর কল্যাণে। মারলোর কোলকাতা গমনের এই অসমর্থিত ঘোষণাটাই আমাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বিষয় ছিল 'ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য', তাছাড়া ইংরেজিটাও বেশ দখলে। তাই জাপানের বেশ ক'টি সংবাদপত্র ও সাময়িকী আমাকে এই দায়িত্বের জন্য যোগ্য মনে করে। আমার এক

নাওয়াকি উসুই'র পাঠানো অসংখ্য রিপোর্ট এবং ছবি ছাপা হয়েছিল জাপানের বিভিন্ন পত্রিকায়। ফলে জাপানি জনগণ সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে

একদল অকুতভয় মুক্তিযোদ্ধা

সিনিয়র এ ব্যাপারে বেশ সাহায্য করেন। সবার ধারণা ছিল, মারলোর সঙ্গে আসবেন তার বেশকিছু ফরাসি সাহায্যকারী। সুতরাং আমার ফরাসি ভাষা জানাটা একেবারে তাদের কাছাকাছি যাবার সুযোগ করে দেবে। যদিও মারলো আর পরে কোলকাতা যাননি।

২০০০ : কখন আপনি কোলকাতা পৌঁছলেন?

নাওয়াকি উসুই : নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই কোলকাতা গেলাম। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা ছিল। যদিও আমি যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করতে সেক্টরে সেক্টরেই বেশি ছিলাম।

২০০০ : স্বাধীনতা যুদ্ধে জাপানের ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের বিপক্ষে। সেদিনের জাপান ছিল একেবারে পা থেকে মাথা পর্যন্ত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিরোধিতা করে যাওয়া পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাববলয়ে নিমজ্জিত দেশ। সেক্ষেত্রে জাপানের সাধারণ জনগণের মনোভাব কি ছিল?

নাওয়াকি উসুই : জাপান সরকারের ভূমিকা যাই থাকুক, জাপানি জনগণ ছিল পুরোপুরি স্বাধীনতার পক্ষে। শুরুতে সংবাদ পাঠানোতে পাকবাহিনীর হস্তক্ষেপ থাকলেও পরে আমরা বিশেষ কায়দায় আসল সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থা করলে শুরুতেই বিভ্রান্ত সাধারণ জাপানিরা স্বাধীনতার পক্ষের দিকেই এগিয়ে আসে। স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরত্বের কথা, পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা, গণধর্ষণ, লুট, নির্বিচারে গণহত্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়মিত জাপানি পত্রিকায় প্রকাশিত হলে মানুষ মানবিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যে এগিয়ে আসে। মায়নিচি শিম্বুনে একাত্তরের মাঝামাঝি প্রকাশিত কুকুরের ভক্ষণরত মরদেহের ছবিটি জাপানিদের প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে। মানবতাবাদী সংগঠনগুলো তৎপর হয় এবং সাধারণ জনগণ শরণার্থীদের সাহায্যে মুক্তহস্তে সাহায্য করে। সরকারও বাধ্য হয়ে কিছুটা নমনীয় হয়ে ওঠে।

> মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি নিশ্চিত চাকরি জীবনের মায়া ত্যাগ করে অনিশ্চিত যাত্রায় ছোটেন। তার ভাষায়, 'দেশকে মুক্ত করার মহান দায়িত্বের কাছে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সব লোভ পর্যুদস্ত হয়ে যায়

২০০০ : মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম আপনি কখন দেখলেন?

নাওয়াকি উসুই : কোলকাতা পৌঁছেই আমি কোলকাতায় অবস্থানরত বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হই এবং প্রচুর লিংক পেয়ে যাই। কোলকাতায় অবস্থানরত স্বাধীন বাংলার অস্থায়ী কেন্দ্রেও যাই এবং প্রবাসী সরকারের অনেকের সঙ্গেই দেখা করি। সাতাশ বছরের আমি তখন ছিলাম একজন সিরিয়াস সাংবাদিক- সংবাদ সংগ্রহটা বিশেষ করে সত্য সংবাদ সংগ্রহ করাটাকে আমার প্রধান নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করি। প্রচন্ড ঝুঁকি নিয়ে তোলা অন্যান্য বিদেশী ও স্থানীয় সাংবাদিক তাদের লেখা, তথ্য ও ছবি দিলে তা প্রত্যাখ্যান করেছি। পরদিন সবার অলক্ষ্যে সেখানেই গিয়ে ছবি ও সংবাদ সংগ্রহ করি। প্রায় দু' ঘন্টা ট্রেন জার্নি ও ৪ ঘন্টা দুর্গম পথ হেঁটে প্রথম একটি মুক্তি ক্যাম্পে পৌঁছি। রাতের আঁধারে তাদের সঙ্গেই আমি একটি ক্যাম্পে যাই। এলাকার নাম মনে নেই। তবে তা যশোর শহরের কাছাকাছি। একটা ব্রিজের ওপর অবস্থানরত অস্থায়ী পাকিস্তানি ক্যাম্প ধ্বংসের অপারেশন

বিজয়ের আনন্দে অংশীদার সবাই

ছিল। ভাষা সমস্যাটা বেশ প্রকট হয়ে উঠেছিল। কেননা, মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা ছিল একেবারে কম বয়সের সাধারণ ছেলে। ফলে ইংরেজি জানা ছেলেরা ছিল না বললেই চলে। মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে, পরিখায় খাওয়া ও থাকার অভিজ্ঞতাও আমার আছে।

২০০০ : ফরাসি চিন্তাবিদ আন্দ্রে মারলো তো শেষমেশ কোলকাতায় গেলেন না, তারপরও আপনার থেকে যাওয়াটা কিভাবে হলো?

নাওয়াকি উসুই : না, নিয়োগকর্তারা আমার ইতিমধ্যে পাঠানো দু'চারটা রিপোর্টিং দেখেই আমাকে থেকে যাবার নির্দেশ দিলেন। বস্তুত, সে সময় কোনো জাপানি সাংবাদিক কর্তৃক পাঠানো রিপোর্টিংয়ে আমার বিকল্প ছিল না। রয়টার বা অন্যান্য সংবাদ সংস্থা কর্তৃক ছবি ও রিপোর্টিং কিনে ছাপালে মর্যাদাপদ জাপানি সাময়িকীর জন্য সহায়ক ছিল না। আমারও আগ্রহ ছিল। কেননা, যুদ্ধের গতির ওপর নজর রেখে যাওয়ায় সংবাদের অফুরান উৎসের সন্ধান আমি অল্প দিনেই পেয়ে যাই। সেই সূত্র ধরে শেষ পর্যন্ত যশোর হয়ে খুলনা যাত্রা।

> জাপান সরকারের ভূমিকা যাই থাকুক, জাপানি জনগণ ছিল পুরোপুরি স্বাধীনতার পক্ষে। শুরুতে সংবাদ পাঠানোতে পাকবাহিনীর হস্তক্ষেপ থাকলেও পরে আমরা বিশেষ কায়দায় আসল সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থা করলে শুরুতেই বিভ্রান্ত সাধারণ জাপানিরা স্বাধীনতার পক্ষের দিকেই এগিয়ে আসে

২০০০ : আপনার যশোর ও খুলনা যাত্রা বিষয়ে কিছু বলুন?

নাওয়াকি উসুই : বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় বাহিনীর অন্তর্বর্তী একটা দল এবং অল্প কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে যশোরের পথে যাত্রা করি। রাস্তাঘাট ছিল না, সব ছিল বিধ্বস্ত- ব্রিজগুলোও ইতিমধ্যে ভেঙে দেয়া হয়েছে। হেঁটে, ট্রাকে, সাঁজোয়া ট্যাঙ্কে যশোর পৌঁছি। ইতিমধ্যেই যশোর শত্রুমুক্ত হয়েছে। সম্ভবত জেলা শহর হিসেবে যশোরই প্রথম মুক্ত হয়। এরপর আমরা খুলনার পথে রওয়ানা দেই- জনগণ তখন মুক্তির আনন্দে দিশেহারা, উৎসবে মত্ত- সবাই হাত নেড়ে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। চারদিক জুড়ে যে গান শোনা যাচ্ছিল স্বাভাবিকভাবেই তা হচ্ছে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।'

২০০০ : খুলনায় পরাজিত বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে আপনি উপস্থিত ছিলেন- এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

নাওয়াকি উসুই : হ্যাঁ আমি এই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করি। ভাবতে অবাক লাগে মাত্র ক'ঘন্টা আগের বলদর্পী বীররা কিভাবে মাথানত করে, অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে শত্রুর দেশ ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। দু'ধারের উৎফুল্ল বিজয়-উল্লাসীর ঘৃণা কিভাবে হজম করতে করতে তারা বাংলাদেশের সীমান্ত পার হয়ে যায়।

২০০০ : বিজয় উল্লাসের সে সময়ের কোনো ঘটনার কথা কি মনে আছে?

নাওয়াকি উসুই : খুলনা থেকে ফেরার পথে সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় বাঁশের বেড়ার ঘের দিয়ে তৈরি করা চায়ের দোকানে হঠাৎ করেই দেখা পাওয়া একজন মুক্তিযোদ্ধার কথা মনে পড়ে। আমরা চা খেতে ঐ দোকানে ঢুকলে পরে সেই মুক্তিযোদ্ধাও দ্রুত দোকানে প্রবেশ করে তার অটোমেটিক রাইফেলটি সশব্দে টেবিলের ওপর রাখলে চমকে উঠি। তরুণ আমার দিকে এগিয়ে এসে জাপানি ভাষায় আমার কুশল জানতে চান। অন্তরঙ্গ আলোচনার পর তার পরিচয় জানি। তরুণ এই প্রকৌশলী তখন চট্টগ্রাম স্টিল মিলে কর্মরত থাকা অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন- এক সময় তিনি জাপানের কোবেতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি নিশ্চিত চাকরি জীবনের মায়া ত্যাগ করে

অনিশ্চিত যাত্রায় ছোটেন। তার ভাষায়, 'দেশকে মুক্ত করার মহান দায়িত্বের কাছে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সব লোভ পর্যুদস্ত হয়ে যায়'। দেশ স্বাধীন হয়েছে এবার তিনি ফিরে যাবেন তার পুরনো কর্মস্থলে। দেশ পুনর্গঠনেও ভূমিকা রাখতে হবে।

[এ পর্যায়ে নাওয়াকি উসুই কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে কি যেন চিন্তা করতে থাকেন, অনেকক্ষণ পর চিৎকার করে ওঠেন। পেয়েছি-মনে করতে পেরেছি সেই তরুণ প্রকৌশলীর নাম... নামরুজ্জামান (বুঝলাম কামরুজ্জামান)। ছবির পাহাড় থেকে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল হাতে শ্মশ্রু-স্বজাত এক তরুণের ছবি দেখিয়ে দেন।]

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে সাংবাদিক নাওয়াকি উসুই ১৯৭১ সালে তোলা অসংখ্য ছবি থেকে প্রায় ১০০টি ছবি দান করেছেন। ছবিগুলো ঢাকায় প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। ফলে এই ছবিগুলো ক'দিন আগে EMS-এর মাধ্যমে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। ছবিগুলোকে আটকে দিয়েছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এবং কর হিসেবে ২০ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার দলিল এই স্মারক ছবিগুলো কি 'কর'-এর আওতায় পড়ে? জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যে সাংবাদিক এই ছবিগুলো তুলেছেন, যিনি ৩২ বছর ধরে ছবিগুলো সযত্নে রেখেছেন এবং আজ তা বাংলাদেশকে দান করছেন। দেশের জন্য মহামূল্যবান এই সম্পদকে 'কর'-এর আওতায় এনে এই ছবিগুলোকে 'পণ্য' হিসেবে চিহ্নিত না করলে কি চলতো না নাকি মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, রাজাকার বিষয়ক ছবিগুলো জোট সরকারের অঙ্গ স্বাধীনতা বিরোধীদলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছিল? প্রধান শাসকদল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি প্রধানমন্ত্রী কি তার দৃষ্টির অলক্ষে সুচতুরভাবে স্বাধীনতা বিরোধীদের তৎপরতায় নজরদারির উদ্যোগ নেবেন না?

'বাংলাদেশের জন্মের আমি একজন প্রত্যক্ষদর্শী'

নাওয়াকি উসুই

তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত থেকে যে চল্লিশটিরও বেশি দেশ ও ভূখন্ড দেখার সুযোগ আমার হয়, সেই তালিকায় উত্তর কোরিয়া আর উত্তর মেরুর মতো ব্যতিক্রমী কিছু জায়গাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বয়স ষাটের কোঠায় পৌঁছে যাওয়ার মুখে বন্ধুদের অনেকেই যে উপদেশ ইদানীং আমাকে দিচ্ছেন তা হলো, সাংবাদিকতায় ব্যস্ত জীবন থেকে সরে এসে অবকাশের চিন্তা-ভাবনা বোধ হয় এখন করা দরকার। তবে আমার উত্তর হচ্ছে, শুধু নিজের মৃতদেহের ওপর দিয়েই তেমন সুযোগ হয়তো হবে।

যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে ১৯৪৩ সালে টোকিওতে জন্ম হলেও শৈশব আর কিশোর জীবনের বড় একটা সময় আমার কেটেছে উত্তরের বরফ-ঢাকা দ্বীপ হোক্কাইডোতে। প্রকৃতি আর বন্য জীবনের কাছাকাছি সেই সময়ে অবসরের বড় একটা মাধ্যম ছিল স্কি করে সময় কাটানো। তবে সেই সময়েই বিখ্যাত ফটোগ্রাফার রবার্ট কাপার কিছুটা প্রাণোচ্ছল ও আবেগপূর্ণ আত্মজীবনী Slightly out of Focus এবং ফরাসি সাহিত্যিক জান লার্তেগির উপন্যাস পাঠ করার পর যুদ্ধের খবর সংগ্রহের সাংবাদিক হওয়ার বাসনা প্রথম আমার মনে দেখা দেয়।

তবে কথা হচ্ছে, মনের বাসনাকে বাস্তবে কঠিন সত্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়া আমাদের পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না। তবে আমার নিজের বেলায় ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের ডামাডোলে মানুষের দুর্দশার সংবাদ সংগ্রহে আমাকে নিয়োজিত করে দেখার যে সুপারিশ তার এক পরিচিত সম্পাদকের কাছে করেছিলেন, সেটাই শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনের সূচনা হয়ে আমার জীবনে দেখা দেয়। বন্ধুর যুক্তি ছিল, 'যেহেতু বিখ্যাত ফরাসি নাগরিক আন্দ্রে মারলো ট্যাঙ্ক ব্যাটেলিয়ন নিয়ে বাংলাদেশের অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন, ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করা উসুই নিঃসন্দেহে হতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ। সেই ঘটনার বিস্তারিত সংবাদ যুদ্ধ ফ্রন্ট থেকে সংগ্রহ করায় সবচেয়ে যুৎসই ব্যক্তিত্ব।'

সেই থেকে সাংবাদিকতার বিস্তৃত পথে আমার যাত্রা শুরু হলেও আন্দ্রে মারলোর কিন্তু সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়া সেবার সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সহিংসা আর সংঘাতময় বিশ্বের প্রথম সেই সরাসরি অভিজ্ঞতার পর ১৯৭২-৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট, পল, মিনেসোটার World Press Institute-এর ফেলো আমি মনোনীত হই। তরুণ প্রতিভাবান সাংবাদিকদের সামনে জগতের দুয়ার আরও কিছুটা খুলে দেয়া ছিল সেই ফেলোশিপের লক্ষ্য। যুক্তরাষ্ট্রের ৪৩টি অঙ্গরাজ্য ভ্রমণের সুযোগই কেবল আমার জন্য তখন হয়নি, একই সঙ্গে অ্যাপেলো ১৭ নভোযানের চন্দ্র যাত্রা ও সিনেটর জর্জ ম্যাকগভার্নের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মনোনীত হওয়ার প্রচারাভিযানও সাংবাদিক হিসেবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ সেবার আমি পাই। যুক্তরাষ্ট্রের সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ঝুলিতে রেখে এরপর আমি পাড়ি দেই আরেক সংঘাতময় এলাকা উত্তর আয়ারল্যান্ডে। বলতে দ্বিধা নেই, সেই সময়ের বেলফাস্ট হচ্ছে আমার দেখা সবচেয়ে ভীতিকর শহরগুলোর একটি। আমার পরে গন্তব্য ছিল মধ্যপ্রাচ্য, ১৯৭৩ সালের ইয়ম কাপুর যুদ্ধের অল্প কিছু দিন পর যেখানে আমি গিয়েছিলাম। দেশে ফিরে আসার পর বিস্ময়ে আমাকে লক্ষ্য করতে হয়, আমার নিজের দেখা বেশকিছু শহর কিভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

১৯৭৪ সালে বার্তা সংস্থা এপি'র টোকিও ব্যুরোতে আমি যোগ দেই। বার্তা সংস্থার রিপোর্টার হিসেবে জিমি কার্টারের নির্বাচনী প্রচারাভিযান থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্রদের যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন, বিমান ছিনতাই, জাপানি ঔপন্যাসিক ইয়ুকিও মিশিমার অনুসারীদের টোকিওর কেইদানরেন ভবন দখল- এরকম বহুবিধ ঘটনাবলীর সংবাদ আমাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। আমার পরের কর্মস্থল ছিল Mcgrew Hill World News, যেখানে তিন বছর ধরে কাজ করার পর ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতাকে শেষ পর্যন্ত নিজের মানানসই পথ হিসেবে আমি বেছে নেই। সেই সিদ্ধান্তের জন্য কোনো রকম অনুতাপে কিন্তু কখনই আমাকে ভুগতে হয়নি।

এদিকে জাপানে বিদেশী সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকের মহলে সক্রিয় উপস্থিতি সবসময় আমি বজায় রেখেছি। পর পর তিনবার সহসভাপতির দায়িত্ব পালনের পর ১৯৮৭-৮৮ সালে আমি টোকিওর বিদেশী সাংবাদিকদের প্রেসক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হই। এছাড়া ক্লাবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত কর্মকান্ড সংক্রান্ত কমিটি ছাড়াও অন্য আরও বেশ কিছু কমিটিতে বিভিন্ন মেয়াদে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হয়েছে।

তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত সাংবাদিকতা পেশার দিকে পেছন ফিরে তাকালে মধুর যে ধ্বনি আমার কানে বেজে ওঠে তা হলো সেই একটি দেশের নাম, যা হচ্ছে বাংলাদেশ। সেটা হচ্ছে আমার সাংবাদিকতার জীবনে প্রথমবারের মতো সত্যিকার অর্থে গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত দায়িত্ব পালনের দেশ। শুধু মৃত্যুকেই যেখানে আমি কাছে থেকে দেখিনি, একই সঙ্গে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ, স্বাধীনতা পাগল আর সত্যিকার অর্থে সুখী মানুষের দেখাও সেখানেই আমি পাই। প্রথাগত ধর্মবিশ্বাসে আমার আস্থা নেই। তবে তা সত্ত্বেও মাঝেমধ্যে প্রার্থনা আমি করি। আর আমার মনের একান্ত সেই প্রার্থনা হচ্ছে ওই দেশটির ক্রমাগত অগ্রযাত্রা আর সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা, যে দেশের জন্মের আমি হলাম একজন প্রত্যক্ষদর্শী।